

Vol. 3 | No. 1 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র

Volume	3
Issue	1
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 15, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i1.3
Pages	61-96
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র

Check for updates

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

সাহিত্যে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে ও ব্যক্তিজীবনে—সর্বত্রই প্যারীচাঁদ মিত্র অবিসংবাদী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানানুশীলনে যেমন ছিল অদম্য স্পৃহা তেমনি ছিল অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা ও অনুসন্ধিৎসা। এই অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও চিন্তাশীলতা অবশ্য সেই যুগেরই সাধারণ লক্ষণ। বাঙলা সাহিত্যের সেই ক্রান্তিকালের প্রথমাংশের যুগপুরুষ রামমোহন, শেষাংশের বিদ্যাসাগর; মধ্যবর্তীকাল 'ইয়ং বেঙ্গল'দের চাঞ্চল্যমুখর। প্যারীচাঁদ মিত্রের মানস গঠিত হয়েছে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আলোকে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের সঙ্গে, আর তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে বিদ্যাসাগরের সমকালে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই কলকাতায় পারীচাঁদের জন্ম। ১৮২৭এর ৭ই জুলাই তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন; এক বছর আগে (১৮২৬) ডিরোজিও এই কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৮২৯এ সতীদাহরহিত আইন পাশ হয় এবং ১৮৩০এর ১৫ই নভেম্বর রামমোহন বিলেত যাত্রা করেন—তাঁর এ যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় ভারতের অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করা। ১৮৩১এর এপ্রিলে কলেজ কমিটির হিন্দু সভ্যদের চক্রান্তের ফলে ডিরোজিও পদত্যাগ ক'রে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন; কিন্তু এ বছরেই ১৭ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৩১এর আগষ্ট থেকেই ডিরোজিওর ছাত্রেরা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলার পরিচয় দিতে শুরু করেন[১] এবং ১৮৩২এর শেষাংশে প্রথমে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭ই অক্টোবর)—ডিরোজিওর এই দুই ছাত্র খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৩৩এ রামমোহনের চেষ্টায় ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীরা ডেপুটী

১। এর একটি চমৎকার বিবরণ আছে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (নিউ এজ। কলিকাতা ১৩৬২) গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য: পৃ ১০৬।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ পর্যন্ত পাবার অধিকার পেল ; ইতিপূর্বে তাদের চূড়ান্ত অধিকার ছিল সেরেস্তাদারের পদ পর্যন্ত। এই ১৮৩৩এর ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহনের মৃত্যু হয়, এবং এই বছরই রামতনু লাহিড়ী ছাত্রজীবন শেষ করে হিন্দু কলেজেরই অধ্যাপক হন। আর কৃতীছাত্র হিসেবে প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৩৬ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ক্যালকাটা পাবলিক লাব্রেরীর সাব-লাইব্রেরীয়ান পদ গ্রহণ করেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, প্যারীচাঁদ ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে এবং ডিরোজিও-র ছাত্রদের অনেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ১৮৪৮ সালে প্যারীচাঁদ পূর্বোক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদ পেলেন। ইতিপূর্বে তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং ১৮৫৫ সালে নিজের দুই পুত্রকে অংশীদার করে তিনি 'প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্য তিনি লাইব্রেরীয়ান পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তাঁকে আজীবন কিউরেটর ও কাউন্সিলরের মর্যাদা দেন।

উনিশ শতকের সেই সামাজিক ভাঙাগড়ার দিনে কুলীন-অভিজাতের জন্য সমাজের উচ্চমঞ্চ আর নির্দ্দিষ্ট রইল না ; সমাজ শাসনের ভার নেমে এলো 'বিদ্য:' ও 'বিত্ত' অধিকারীদের হাতে।[২] প্যারীচাঁদ মিত্র বৈষয়িক উন্নতির জন্য যেমন শ্রমশীল ছিলেন তেমনি পরিশ্রমী ছিলেন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও। ছাত্রজীবনেই তিনি নিজের বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[৩] এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন, বীটন সোসাইটী, পশু ক্লেশ নিবারণী সভা, বঙ্গদেশীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার এণ্ড হর্টিকালচার সোসাইটি এবং সবশেষে থিয়োসফিকাল সোসাইটির পরম উৎসাহী কর্মী ছিলেন।[৪] কিন্তু তিনি সর্বাধিক স্মরণীয় তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। বস্তুত ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন

২। দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম খণ্ড। (বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ১৩৬৪)।

৩। দ্রষ্টব্য : শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত। পৃ ১২৯।

৪। (ক) "কেবল যে নামমাত্র সভ্য ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সভ্য থাকার অর্থ ছিল সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা।"—শিবনাথ শাস্ত্রী। ঐ। পৃ ১৩২।

রেখে গেছেন। এর কারণ হচ্ছে: ডিরোজিওর ছাত্র হলেও প্যারীচাঁদ মিত্র অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মত উগ্রস্বভাবের ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, "ডিরোজিওর মধ্যে নবযৌবনের অসংকোচ ছিল……, কিন্তু কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ছিলনা তাঁর আচরণে। তাঁর ছাত্রদের আচরণে যে বাড়াবাড়ি দেখা দিল তা তাঁদের বিশেষ পরিবেশের ফল—সেই পরিবেশে ধর্মের নামে মিথ্যাচার চলেছিল ব্যাপকভাবে, এই ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তারই অদ্ভুত, হয়তবা সাময়িক, প্রতিক্রিয়া।"[৫] আগেই বলেছি, প্যারিচাঁদ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ

৪।(খ) 'প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথমে (১৮৩৯ সালে) "কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোম্পানী"তে আমদানি-রফতানির কাজ করেন। পরে ১৮৫৫ সালে দুই ছেলেকে নিয়ে "প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স" কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বাধীন বানিজ্যে প্রবৃত্ত হন। "গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল কোং লিঃ", "পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং", "হাওড়া ডকিং কোং লিঃ", ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি "বেঙ্গল টি কোং" "ডারা টি কোং লিঃ"-এরও ডিরেক্টর ছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতন সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্যারীচাঁদের অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৮ সালে যখন "দি সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ" প্রতিষ্ঠা হয় তখন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী তার যুগ্ম-সম্পাদক হন। "দি বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির" (১৮৪৩) সভাপতি ছিলেন জর্জ টমসন, অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি গোড়া থেকেই "দি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" (১৮৫১), "বীটন সোসাইটি" (১৮৫১), "দি ক্যাল্‌কাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেন্‌শন অফ্‌ ক্রুয়েলটি টু এনিম্যাল্‌স" (১৮৬১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বেভারলি সাহেব ও প্যারীচাঁদ "দি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের (১৮৬৭) যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৮২০ সালে কেরী সাহেব এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য যে "এগ্রিকালচার এণ্ড হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া"র প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪৮ সালে প্যারীচাঁদ তার সদস্য হন, কৃষিবিষয়ে সোসাইটির জার্নালে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং অনেক ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন।' —বিনয় ঘোষ। বাঙলার নবজাগৃতি, প্রথম খণ্ড (ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড। কলিকাতা ১৩৫৫)। পৃ ১৭৫।

৫। (ক) কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার জাগরণ (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলিকাতা ১৩৬৩) পৃ ৫২।

(খ) অবশ্য উগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির দেশপ্রীতিও যে সদাজাগ্রত ছিল সে কথা স্মর্তব্য। দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত। পৃ ১১২-১২০।

করেন তখন 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কর্ণধারেরা প্রায় সকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাই 'ইয়ং বেঙ্গল'দের পরিমণ্ডলে মানসগঠিত হলেও তাঁদের উগ্রস্বভাব তিনি বর্জন করেছিলেন সযত্নে; কেননা প্রথমত এই উচ্ছৃঙ্খলার পরিণাম তিনি লক্ষ্য করেছিলেন খুব কাছ থেকে, তাছাড়া রামমোহনের আদর্শও ছিল সামনে এবং সর্বোপরি, কৃতিছাত্র হিসেবে তিনি পূর্বাপরই ছিলেন উচ্ছৃঙ্খলতা-বিরোধী। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'দের পরিমণ্ডলে থেকে তিনি লাভ করেছিলেন মুক্তদৃষ্টি এবং অপূর্ব কর্মোদ্যম। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা।

প্রাচ্য ঐতিহ্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করার পর রামমোহন পশ্চাত্যজ্ঞান আহরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই প্রাচ্য-ভিত্তি ছিল বলেই তিনি কখনো সত্যবিচারের সমদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেননি। তাই দেশের মঙ্গলার্থে তিনি প্রাচ্যকে বর্জন ক'রে পাশ্চাত্যকে আঁকড়ে ধরেননি 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মত। বরং এক সমন্বয়ের চেষ্টা ছিল তাঁর এবং এ জন্যেই তিনি মানবীয় দৃষ্টিকোন থেকে এক নতুন উদার ধর্মের প্রবর্তন করলেন—গড়ে তুললেন ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর থেকেই এই ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্তিমিত হয়ে এল এবং এ সময়ে সমাজে 'ইয়ং বেঙ্গল'দেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেল। ইতোমধ্যে আলেকজাণ্ডার ডাফে প্রচারিত খৃষ্টধর্মের আকর্ষণ বেড়ে গেল শিক্ষিতদের মধ্যে। সনাতন পন্থীরা রামমোহনেরই বিরোধিতা করেছিলেন তাই 'ইয়ং বেঙ্গলদল' তাঁদের কাছে ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠল। ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবান্ধব ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং এ সময় থেকে ব্রাহ্মসমাজে আবার উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি হতে লাগল। এরই মধ্যে কর্মীপুরুষ কেশবচন্দ্রের আগমনে ব্রাহ্মধর্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলিত শক্তিতে সনাতনপন্থী ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের দুই মেরুকে প্রায় একত্রিত করে ফেলল। ব্রাহ্মসমাজ একদিকে যেমন সনাতনপন্থীদের গোড়ামী ও অন্ধদৃষ্টির নিন্দা করল অন্যদিকে তেমনি নব্যদলের অত্যধিক উচ্ছৃঙ্খলা প্রশমিত করতে সচেষ্ট হল। আর এরই মধ্যে যুগ-পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হল। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর তিনি নবজাগ্রত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে স্বীকৃতিলাভ করলেন। এবং এরপর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালীসমাজ

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব-শাসিত। রামমোহনের মত তিনিও ছিলেন 'হিউম্যানিষ্ট পণ্ডিত'।[৬] তিনিও প্রাচ্য-মনীষার দৃঢ় ভিত্তির উপরে পশ্চাত্যজ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি সমাজচিন্তা ও নির্দেশ ছিল অভ্রান্ত।

বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদের বয়োকনিষ্ঠ।[৭] সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তিনি পেয়েছেন অনেক পরে। কিন্তু সাহিত্য সাধনার দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদের অগ্রজ। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগী হিসেবে প্যারীচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা' নামে 'স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্তে' একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার ৭ম সংখ্যা (১ম বর্ষ) থেকে তাঁর বহুখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হ'তে থাকে।[৮] এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে।[৯] কিন্তু ইতোমধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো প্রকাশ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।[১০] প্যারীচাঁদ অন্তত ভাষারীতির দিক থেকে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করবার জন্যেই যেন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এ উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ছিল বটে। তবু প্যারীচাঁদ-মানসে, প্রথম পর্যায়ে গৌণ হলেও, সাহিত্য রচনার স্বতন্ত্র কারণও ছিল। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিজের মুক্ত বিচার-দৃষ্টি তাঁকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনা বহুলাংশে ব্রাহ্মধর্মেরই সপক্ষে নিয়োজিত হয়েছে।

৬। দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ : প্রথম খণ্ড। পৃ ৪৮-৬৪।

৭। বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ খৃষ্টাব্দ।

৮। দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'আলালের ঘরের দুলাল' (তৃ-স ১৩৬২)। ভূমিকা। পৃ ।/০।

৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (ঢাকা ১৯৫৬) 'আলালের ঘরের দুলালের' প্রকাশকাল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বলা হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ জাতীয় অনুমানে ভ্রান্তির কারণ নির্দেশ করেছেন। দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত। পৃ ।৶০ পাদটিকা।

১০। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৬), সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুটো প্রস্তাব (১৮৫৫), ইত্যাদি।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধিতা করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন।[১১] "১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় একটি বিশেষ বিবাহ-বিধি পাশ করা হল—যা তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য যাঁরা নিজেদের প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করেন না।" এতে হিন্দু সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কেশবচন্দ্র বলেন: The term Hindu does not include the Brahmo। প্রতিবাদে ১৮৭৩ সালে রাজনারায়ন বসু লেখেন: ব্রাহ্মধর্ম উন্নতি হিন্দু ধর্ম।[১২] এ সময়ে ডফের খৃষ্টধর্মান্দোলনের হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সনাতনপন্থী ধর্মসমাজের সঙ্গে একত্রে কাজে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে আপনকন্যার বিবাহের কালে কেশবচন্দ্র স্বপ্রতিষ্ঠিত বিবাহবিধি লঙ্ঘন করায় এবং অন্যান্য কারণে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। "কেশবচন্দ্রের বিরোধীদল নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। তাঁরাই হলেন ব্রাহ্মদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশিষ্ট শিষ্যদের নিয়ে কেশবচন্দ্র গড়লেন 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ', আর মন্থরগতি ব্রাহ্মরা এতদিন 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত ছিলেন, এবার তাঁরা নিজদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন 'আদিব্রাহ্ম সমাজ"।[১৩]

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ 'বঙ্গদেশে ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য' মনোনীত হন। এ পদে তিনি দু'বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪] ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু হয়। তাঁর "মৃত্যুতে 'হিন্দু পেটরিয়ট' লেখেন: 'In him the country loses a literary veteran, a devoted worker, a distinguished author, a clever wit, an earnest patriot and an enthusiastic enquirer.'"[১৫] বলাবাহুল্য, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত এই বিশেষণরাজির কোনটিই অতিরঞ্জনদুষ্ট নয়।

১১। কাজী আবদুল ওদুদ। পূর্বোক্ত। পৃ ৯৩ দ্রষ্টব্য।
'অভেদী'তে ব্রাহ্মসমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র আছে।
১২। কাজী আবদুল ওদুদ। ঐ। পৃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।
১৩। ঐ। পৃ ১০৯।
১৪। দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত। পৃ ১৩২।
১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। পূর্বোক্ত। পৃ ১, উদ্ধৃত।

দুই

সাহিত্যকর্মী হিসেবে প্যারীচাঁদের খ্যাতির উৎস তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ সর্বমোট ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তার ১১ খানি বাঙলা।[১৬] কিন্তু কালের অবক্ষয় এড়িয়ে ওই একটি মাত্র গ্রন্থই নিত্যকালের বাঙালীর কাছে তাঁর পরিচয় চিরভাস্বর করে রাখবে। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলাল' ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। আর প্যারীচাঁদের প্রায় সব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হলেও এই একটিগ্রন্থ সহজলভ্য।

১৬। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত গ্রন্থাবলী :

আলালের ঘরের দুলাল ॥ 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যা (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়; তবে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় জৈষ্ঠ ১৩৪৭; তৃ-স পৌষ ১৩৬২। নতুন সাহিত্যভবন থেকে সচিত্র সংস্করণ, প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬৩ ॥

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)। রামারঞ্জিকা (১৮৬০) মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে এটি প্রকাশিত হয়, 'সুতরাং রামারঞ্জিকা প্যারীচাঁদের প্রথম রচনা'—ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ২ (বর্ধমান সাহিত্যসভা। তৃ-স ১৩৬২) পৃ ১৬৯। কৃষিপাঠ (১৮৬১)। গীতাঙ্কুর (ঐ)।; যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫)। অভেদী (১৮৭১)। ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত (১৮৭৮)। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা (ঐ)। আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)। বামাতোষিনী (১৮৮১) ॥ 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে এই গ্রন্থগুলো 'সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত' হ'য়ে তৎ লিখিত 'গ্রন্থকারের জীবনী ও সমালোচনাসহ' 'টেকচাঁদ গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)' নামে প্রকাশিত হয় ॥

এ ছাড়া প্যারীচাঁদ কয়েকটি বাঙলা প্রবন্ধ, ৮টি ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রায় ২৩টি ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ সব রচনার অধিকাংশই থিয়োসফি সংক্রান্ত। তাঁর আলালের ঘরের দুলালের দুটো ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল ॥

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ সংখ্যা। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলিকাতা। পঞ্চম সং ১৩৬২)। পৃ ১৯১—১৯৬।

তবু প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙলা সাহিত্যের অধিক কথিত এবং অল্প আলোচিত গ্রন্থকারদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা হয়েছে প্রায়ক্ষেত্রেই তা ভাষার ইতিহাসে তাঁর গুরুত্বসম্পর্কিত এবং সে আলোচনাও প্রধানত 'আলালের ঘরের দুলাল'-কেন্দ্রিক; সুতরাং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্রের যে ভূমিকা তা আদৌ উপেক্ষনীয় নয়; এবং নয় বলেই, তা স্বতই পুনর্বিচারের দাবী রাখে।

আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উপন্যাস বিচারের একটা মূলকথা মনে পড়ছে: "One looks to the novel less for its significance in the history of ideas than for its connexions with social history, of which it is often a transposition or more or less a deliberate commentary. It may show us the physical manner in which people lived at a particular date, but it is also likely to deal with the personal relationships of people living together in a social group and regulated in their conduct by the prevailing conventions"।[১৭] কথাটি পরিণত পর্যায়ের উপন্যাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হলেও বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূত্রপাত সমাজ-সমালোচনা হিসেবেই—সমকালীন জীবনের 'deliberate commentary' রূপেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই উপন্যাসের পূর্বসূত্র হিসেবে ঐতিহাসিক কাহিনী বা রোমান্সমূলক কাহিনী বিদ্যমান; অথচ আধুনিক বাঙলা গদ্যে উপন্যাসের জন্ম হ'ল এই তথাকথিত অতি আবশ্যক স্তরকে অতিক্রম করে, আর ততোধিক বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে: নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজই হল তার ভিত্তিভূমি। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্রের আজীবন 'রোমান্স' রচনার তাৎপর্য এই সূত্রেই নিহিত বলে মনে হয়: প্রথম যুগের এই উল্লম্ফনের কারণেই বঙ্কিমকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। এদিক থেকে বঙ্কিম

১৭। Geoffrey Brereton: A Short History of French Literature, (Penguin Books. London. 1956 edn.) ch 8, p 108.

মানসের নবমূল্যায়ণ হয়ত অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য সাধনায় রোমান্স রসের পরিচয় মেলে সত্য; কিন্তু আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের পূর্বসূত্র এ সমস্ত উপাখ্যানে সন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া রোমান্স রসের কাব্য আর রোমান্স মূলক উপন্যাসের ভিত্তি যে স্বতন্ত্র, তা বলা বাহুল্য।

'ইয়ং বেঙ্গল'দের উচ্ছৃঙ্খলতা 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার কারণ হল। এই রক্ষণশীল দলের প্রবক্তা তাঁর 'নববাবু বিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়',[১৮] প্রভৃতি তীক্ষ্ম ব্যাঙ্গাত্মক রচনায় আপাত সূত্রবদ্ধ গল্পের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু মুখ্যত খণ্ডচিত্র রচনায় আগ্রহ থাকায় 'কোন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী' গড়ে উঠল না। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্রই এই 'সম্পূর্ণ সামাজিক কাহিনী গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন'।[১৯] তাঁর সাফল্যের প্রধান কারণ তিনি ভবানীচরণের মত রক্ষণশীল ছিলেন না। সমাজ সমালোচক হিসেবে প্যারীচাঁদের প্রচার্য তত্ত্বকথাটি যেমন সমকালীন মাপ কাঠিতে উদার ও আধুনিক তেমনি সমাজচিত্র হলেও 'আলালের ঘরের দুলালের' স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টরেখায় চিহ্নিত। 'এর মর্মগত সুশিক্ষার বাণী', 'একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক' কাহিনী, কাহিনী বর্ণনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য এবং 'সাহিত্যে লোকায়ত ভাষার প্রথম প্রয়োগ প্রয়াস'[২০]—সব মিলিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন পথের সূচনা করেছে।[২১]

১৮। কলিকাতা কমলালয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা ১৩৪৩।
নববাবু বিলাস। ঐ। ১৩৪৪।

১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্য ভবন সংস্করণ (কলিকাতা ১৩৬৩) আলালের ঘরের দুলালের ভূমিকা। পৃ ৪।

২০। ঐ। পৃ ৬।

২১। প্রয়োজন সামান্য হলেও প্রসঙ্গত Mrs. Hanna Catherine Mullens রচিত 'The history of Phulmani and Karuna, a book for native christian women, ফুলমনি ও করুণার বিবরণ, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে বিরচিত' (কলিকাতা ১৮৫২) গ্রন্থটির কথা এসে পড়ে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে, ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য সহ গ্রন্থটি সম্প্রতি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে (জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, নতুন সংস্করণ ১৩৬৫)।

উনিশ শতকের বংলায় হিন্দু মধ্যবিত্ত জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 'বিত্ত' এবং 'বিদ্যা' যখন সমাজ শাসনের অধিকার অর্জন করল তখন স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র বিত্তের অধিকারীরা উচ্ছৃঙ্খলার চক্রাবর্তে নিমজ্জিত হলেন। এর অবশ্যম্ভাবী অবক্ষয়ী পরিণতি থেকে সমাজকে রক্ষা করবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ

কথিত আছে, এটিই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক গদ্য-কাহিনী। মূল গ্রন্থটি প্রকাশের পর বৎসর (১৮৫৩) এর একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। মিসেস মুলেন্সের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বিশ্বাস বিজয় অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গতির রীতির প্রকাশার্থ উপাখ্যান' (কলিকাতা ১৮৬৭) মূল ইংরেজীর অনুবাদ। অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই শেষোক্ত গ্রন্থটি উদ্ধার করে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মিসেস মুলেন্সের প্রথম গ্রন্থটির বাঙলা মৌলিক রচনার দাবী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন (দ্রষ্টব্য 'Bengali Novel'. Letters to the Editor. The Sunday Statesman. July 12, 1959)। এ প্রশ্নের পেছনে যুক্তি হল: খৃষ্ট ধর্ম প্রচারার্থে যিনি প্রথম গ্রন্থ বাঙলায় রচনা করেছেন তিনি একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনাকালে ইংরেজীর আশ্রয় নেবেন কেন? আট বছরের ব্যবধানে লেখিকার বাঙলা ভুলে যাবার তো কোন কারণ নেই! সুতরাং এমন সন্দেহ করা কি অসঙ্গত যে, 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' মূলগ্রন্থও ইংরেজীতে লেখা হয় এবং যেহেতু তার প্রচার 'native christian women'-দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন সেহেতু তার বাঙলা অনুবাদই প্রথম প্রকাশ করা হয়; হয়ত প্রয়োজনবোধে পরে ইংরেজী গ্রন্থও প্রকাশিত হয়—পরে প্রকাশিত বলে অনুবাদের নাম নিয়ে? নতুন সংস্করণ গ্রন্থটির ভূমিকায় বা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবাবে (দ্রষ্টব্য: 'Bengali Novel.' Letters to the Editor. The Sunday Statesman. July 19, 1959) এ সব প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না।

মৌলিকতা সম্পর্কে এই সন্দেহের অবকাশ ছাড়াও, মুখ্যত দুজন খৃষ্টান রমণীর জীবনযাত্রা প্রণালীর বাইবেল-উদ্ধৃতি-কণ্টকিত এই 'বিবরণে' 'উপন্যাস লক্ষণ' দুর্লক্ষ্য। এবং যে কারণে ভবানীচরণের রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নয় সেই একই কারণে এটিও অগ্রাহ্য। ভূমিকাকার কর্তৃক দাবীকৃত প্রেম-চিত্র রচনার প্রচেষ্টামাত্রই উপন্যাস নয়। বলাবাহুল্য 'আলালের ঘরের দুলাল' ও সীমিত অর্থেই উপন্যাস।

এ ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন: 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' যদি বাঙলা ভাষার প্রথম মৌলিক গদ্য কাহিনী হয়ও তবু 'আলালের ঘরের দুলালের মর্যাদা যে সমস্ত করণে সুপ্রতিষ্ঠিত, তা তৎকালে অনন্যসুলভ, সুতরাং সহজ ভঙ্গুর নয়।

যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে কথা আগেই বলেছি। প্যারীচাঁদ মিত্র এই নবলব্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলেন যে ধর্ম- ও নীতি-হীনতাই এই উচ্ছৃঙ্খলার মুখ্য কারণ। সুতরাং আদর্শ জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যেই রয়েছে এ থেকে মুক্তির পথ। এ কথাই প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি 'আলালের ঘরের দুলালের' কাহিনী নির্মাণ করলেন। আবাল্য অতিআদরে ধনীপুত্র মতিলাল কখনো ধর্ম ও নীতির শিক্ষা পায়নি উপরন্তু অসৎ সঙ্গে সে অবনতির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে; অন্যদিকে মতিলালেরই অনুজ রামলাল আদর্শচরিত্র বরদাবাবুর একান্ত স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়ে, তাঁর সকল নির্দেশ মান্য ক'রে, সর্বজনের প্রশংসা অর্জন ক'রেছে। মতিলালের চৈতন্যোদয় এবং আদর্শজীবনের প্রতি আকর্ষণে গ্রন্থের সমাপ্তি। গ্রন্থের এই দুই প্রধান ঘটনাস্রোত বিচিত্র খণ্ডক্ষুদ্র ঘটনায় পল্লবিত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মূলঘটনা অপেক্ষা এই বিচিত্র খণ্ড ক্ষুদ্র পল্লবিত ঘটনাই গ্রন্থটির আশ্চর্য সফলতার কারণ। "বস্তুতঃ বরদাবাবুর মত মূর্তিমান নীতিপাঠ, বেণীবাবুর মত সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল— এরা কেউই আলালের মূল আকর্ষণ নয়। এদের মধ্যে সুশিক্ষা থাকতে পারে —কিন্তু উপন্যাসের যা প্রধানতম উপকরণ—জীবনের স্পর্শস্বাদ, তা এই চরিত্রগুলিতে কোথাও নেই। 'আলালের অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ হলধর গদাধর ইত্যাদি, ধড়িবাজ মুৎসুদ্দি বাঞ্ছারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বরবাবু ও সর্বোপরি একটী অপরূপ সৃষ্টি ঠকচাচা।··· ···সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল।"... এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই "সেই অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছ।"[২২]

আলালের কাহিনী বিন্যাসে 'Stock situation ও Stock character-এরই বাহুল্য রয়েছে, তবু তার মধ্যেই মানসভঙ্গি অনুযায়ী চরিত্র নির্দেশের সূচনাও ঘটেছে। বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি বা আচরণের আভাসে পার্শ্বচরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবং এ ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ যে বাস্তবতা ও রসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। মতিলালের জীবনকাহিনী রচনাই

২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত, পৃ ৭।

প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, সেদিক থেকে সে-ই এই কাহিনীর নায়ক; কিন্তু উপন্যাসের উত্থান পতন নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠকচাচা। "সেদিক দিয়া দেখিলে ঠকচাচাই আসল নায়ক, এবং তাহা হইলে বইটি 'পিকারেস্ক' নভেলের পর্যায়ে পড়ে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র হইতেছে ঠকচাচা' পুরোনোর সাহিত্যের ভঁাড়ুদত্তের পাশে তাহার স্থান সাহিত্যসৃষ্টির জনবিরল অমরাবতীতে।"[২৩] "সুনীতির মানদণ্ডে ভঁড়ুদত্ত ও ঠকচাচা যতখানি খাটো, সুবাক্যের মানদণ্ডে তাহার ততখানি বড়।"[২৪] 'দুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা বুরা দুই চাই—দুনিয়া সাচ্চা নয়, মুই একা সাচ্চা হ'য়ে কি করবো?'[২৫] ঠকচাচার এই জীবনদর্শনে স্পষ্টোচ্চারিত বাস্তববুদ্ধি চমৎকৃত করে। ঠকচাচা চরিত্রচিত্রণে প্যারীচাঁদের রসচেতনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে:

> 'জাল করিতে, সাক্ষী সাজাইয়া দিতে, দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে, দাঙ্গাহাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল[১] আর একজন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত। তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে, রমজান ঈদ সোবেরাত আমার করা সার্থক, বোধ হয় পিরের কাছে ক'য়ে ফয়তা দিলে আমার কুদরৎ আরও বাড়িয়া উঠিবে।[২৬]

এ গ্রন্থের অধিকাংশ চরিত্রই অসাধু, আর তারা "সকলেই ঠকচাচার প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু প্রতিভার জোরে সে আর সকলকে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, ঠকচাচী

২৩। ডঃ সুকুমার সেন। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস: ২ (বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা। তৃ-স ১৩৬২) পৃ ১৬৭।

২৪। প্রমথ নাথ বিশী। বাংলা সাহিত্যের নরনারী। (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলিকাতা ১৩৬০) পৃ ১৯।

২৫। নতুন সাহিত্য ভবন সং। ১৩ পরিচ্ছেদ। পৃ ৮২।

২৬। ঐ। ৫ পরিচ্ছেদ। পৃ ৩৬-৩৭

ছাড়া ঠকচাচার তুলনা মেলা ভার, কেবল চাচীর কাছে চাচা কিঞ্চিত সংযত"।[২৭] বস্তুতঃ এই গ্রন্থের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ঠকচাচী চরিত্রে প্রবল সম্ভাবনা ছিল। ঠকচাচার মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধড়িবাজ ব্যক্তি যে ঠকচাচীর কাছে কেমন অসহায় তা একটি মাত্র দৃশ্যে আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থিত করা হয়েছে ঃ

> 'যেমন দেবা তেমনি দেবী—ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুইজনই রাজযোটক—স্বামী বুদ্ধির জোরে রোজগার করে—স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু গুমর হয়, তাহার নিকট স্বামীর নির্জ্জলা মান পাওয়া ভার, এইজন্যে ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই একবার মুখঝামটা খাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হরঘড়ি বল যে বহুত কাম, এতনাবাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়। মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভালো ভালো রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখিনা, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বল্‌ব, মোর কেতনা ফিকির—কেতনা ফন্দি—কেতনা প্যাঁচ—কেতনা শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার জল্‌দি এসবে..."[২৮]

আবার গ্রন্থের শেষাংশে 'মানিকজোড়ের' মত ঠকচাচা ও তার সহযোগী বাহুল্য যখন জাহাজে চড়ে দেশান্তরের বন্দীশালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তখন ঠকচাচী সম্বন্ধে ঠকচাচার আশঙ্কা হচ্ছে ঃ 'মোর বড় ডর তেনাবি পেল্টে সাদি করে।' মতিলালের মায়ের চরিত্রের সহিষ্ণুতা ও সংযম বাঙালী মায়ের চিরন্তন রূপের প্রতীক। বাবুরামের দ্বিতীয় বার বিবাহের সংবাদে নাপতানী চরিত্রের উক্তি—'ওমা মুই কোজ্জাব, বুড়ো ঢোক্সা আবার বে করবে?'—প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন দৃষ্টির ও সুকুশল বচন রচনার একটি উজ্জ্বল পরিচয়।

২৭। বিশী। পূর্বোক্ত, পৃ ১৯।

২৮। নতুন সাহিত্য ভবন সং। ১৬ পরিচ্ছেদ। পৃ ৯৪।

বস্তুত বৃহৎ বর্ণনা অপেক্ষা এই সব সামান্য ঘটনা নির্ভরতা প্যারীচাঁদের একটা কৌশল। অবশ্য "কেবল বাস্তব চিত্রাঙ্কণ বা জীবন-পর্যবেক্ষণই উচ্চঅঙ্গের উপন্যাসের একমাত্র গুণ নহে। বাস্তব উপাদানগুলিকে এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন তাহাদের কার্যকারণ-পরম্পরার মধ্য দিয়া জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটা গভীর ও ব্যাপক ধারণা পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে; মানবহৃদয়ের গভীর সনাতন ভাবগুলি যেন তাহাদের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বাহ্য ঘটনার উপরেও একটা অচিন্তিত-পূর্ব গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিতে পারে।"[২৯] 'আলালের ঘরের দুলাল' এ কৃতিত্বে উজ্জ্বল নয় এবং সেদিক দিয়ে এটি Goldsmith এর Vicar of Wakefield এর সমশ্রেনীস্থ। বস্তুতঃ প্যারীচাঁদ তাঁর পরবর্তী বঙ্কিমের মত মানবতার অন্তর্গূঢ় রূপের আবিষ্কারে সক্ষম হননি সত্য, কিন্তু মানবতার বিষয়গত চেতনার পরিচয় আলালের ঘরের দুলালে আছে। এবং তা আদৌ উপেক্ষণীয় নয় বলেই "আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়াত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ পরিণতির ঘোষণা করে।"[৩০]

বাস্তবদৃষ্টি, চরিত্রসৃষ্টি, কৌতুকবোধ ইত্যাদির মত প্যারীচাঁদের ভাষার স্বাতন্ত্র্যও সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। 'আলালের' গদ্যের ভিত্তি সাধুভাষা হলেও সরল ও সর্বজনবোধ্য শব্দ নির্বাচনে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন—'আলালেই' আমরা 'আদর্শ' বাংলা উপন্যাসের ভাষার সর্বপ্রথম ইঙ্গিত পাই। সংলাপ রচনায় প্যারীচাঁদ যেমন বাস্তবতামুখীন তেমনি অসংখ্য প্রবাদ বাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগে তা প্রাণবন্ত। তিনি বাংলা গদ্যরীতিতে 'রঙ্গরস' এনেছেন এবং কাহিনী বলার আকর্ষণী শক্তি তিনি বাংলাভাষায় সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন।

২৯। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। (মডার্ণ বুক এজেন্সি। কলিকাতা, তৃ-স ১৯৫৬) পৃ ২১।

৩০। ঐ। পৃ ২২।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, : "প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"[৩১] অবশ্যই আলালের কৃতিত্ব আকস্মিক নয়। সমাজচিত্র রচনার সমকালীন প্রচেষ্টাকেই প্যারীচাঁদ প্রথম সফল আখ্যায়িকারূপে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তথ্য তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।[৩২] আবার অন্যদিকে বঙ্কিমের তুলনায় প্যারীচাঁদের সীমাবদ্ধতার কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনাবলীর উপর এ গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আলালের ১৭ পরিচ্ছেদে নীল বিদ্রোহের (১৮৫৮-৬০) একটি বর্ণনা আছে ; দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'নীল দর্পণ' নাটক রচনার প্রেরণা পান এখান থেকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' পরিকল্পিত হয় সম্পূর্ণরূপেই আলালের আদর্শানুসরণ করে। বলাবাহুল্য, এই ইতিহাসের ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই 'আলালের ঘরের দুলালে'র যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব।

আলালের ঘরের দুলাল সমকালীন জীবনের 'deliberate commentary', বিশেষ কাল পরিধিতে মানুষের সামাজিক অবস্থা ও তাদের পারস্পরিক আচার আচরণের চিত্র এতে আছে। এদিক দিয়ে Geoffrey Brereton কথিত সফল উপন্যাসের সকল লক্ষণই এতে বিদ্যমান। উপরন্তু এর 'Significance in the history of ideas'-ও কম নয় ; বরং গ্রন্থকারের সেইটেই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থের সামাজিক উপযোগিতা যাই থাক না কেন, ভাষাগত দিক দিয়ে তা যতই মূল্যবান হোক না কেন, একথা সত্য যে প্যারীচাঁদের এক ধর্মগূঢ় চেতনা অন্তঃ সলিলা প্রবাহের মত এর পূর্বাপর ব্যপ্ত রয়েছে। এবং ক্রমান্বয়ে গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে এই চেতনা গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেয়েছে। ফলতঃ, এ কারণেই প্যারীচাঁদের পরবর্তী কোন গ্রন্থই আলালের সমান মর্যাদার অধিকার পায়নি।

৩১। বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান ['লুপ্তরত্নোদ্ধার'-এর ভূমিকা]। বঙ্কিম রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড : সমগ্র সাহিত্য।(সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা ১৩৬১)। পৃ৮৬৩।

স্মর্তব্য : 'great charm consists in its nationality and truth'—প্যারীচাঁদের বন্ধু ই. বি. কাউএল-এর পত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত সম্পাদিত সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভূমিকায় উদ্ধৃত। পৃ ॥০।

৩২। দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পূর্বোক্ত। পৃ ॥০—৶০।

তিন

কৌতুকপ্রিয়তা, বাস্তববুদ্ধি এবং কথার বয়ন-দক্ষতাই 'আলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্রকে প্রথম বাঙলা ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু, প্যারীচাঁদের জীবনবোধ, শিল্পাদর্শ ও সাত্যিকীর্তির পূর্ণ পরিচয় শুধুমাত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' বিধৃত নেই। 'আলাল' পরবর্তী রচনাবলীতে লেখকমানসের যে পরিচয় মেলে তা পূর্বোক্ত গুণকেন্দ্রিক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত ঃ বাস্তবতা থেকে বহু দূরবর্তী, নীরস তত্ত্বপ্রচারমুখী। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আলালের রঙ্গরস ও হাস্যকৌতুকের পশ্চাতে সর্বদাই একটা ধর্মগূঢ় চেতনা ছিল; সুতরাং তাঁর রচনার ধারায় পরবর্তীকালের এই ধর্মপ্রবণতা আকস্মিক নয়। অন্যকথায়, প্যারীচাঁদের রচনার তত্ত্বপ্রচারপ্রবণতা সর্বদাই ছিল; 'আলালে' তা সুগ্রথিত কাহিনীর, সুস্পষ্ট রঙ্গরসের ও সুষ্ঠু বাস্তবতার আবরণে প্রকাশিত হয়েছে আর পরবর্তী রচনাবলীতে পরিণত প্যারীচাঁদ এ আবরণের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করেছেন। এ কারণেই প্যারীচাঁদের সৃষ্টির মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর পরবর্তী রচনাবলীর আলোচনা অপরিহার্য।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলাল'-পরবর্তী রচনাবলীকে আলোচনার সুবিধার্থে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, সমকালীন জীবনচিত্রণ ঃ এ পর্যায়ে একটিমাত্র নক্সা জাতীয় রচনা—'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় ?'; দ্বিতীয়, আধ্যাত্মিক উপন্যাস—'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'রামারঞ্জিকা', 'বামাতোষিনী' ও 'যৎকিঞ্চিৎ' এ পর্যায়ের; তৃতীয়, বিবিধ রচনা—'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা', 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত', 'গীতাঙ্কুর' ইত্যাদি।

১

সমকালীন জীবনচিত্রণ প্যারীচাঁদের সুপরিচিত এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'আলালে'র জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও এটি। এই বৈশিষ্টের পরিচয় উত্তরকালের রচনাবলীর মধ্যে একমাত্র তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় ?' এই নক্সাজাতীয় রচনাতে মেলে।

গ্রন্থটি উপন্যাস নয়, খণ্ডচিত্র। এবং এজাতীয় রচনাতেই প্যারীচাঁদের প্রতিভা অধিকতর স্ফূর্তিলাভ করে। নামকরণ থেকেই গ্রন্থটির উদ্দেশ্যমূলকতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অল্পবিস্তর ইয়ং বেঙ্গলদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েও এদলের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি তীব্র বিদ্রূপের আঘাত হেনেছেন প্যারীচাঁদ; এ আঘাত প্রাচীনপন্থী বা পশ্চাদমুখী নয় বলে 'মদ্যনিবারণী সভা'র উদ্দেশ্যে সহায়ক হয়েছিলে।

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ জুড়ে ছোট ছোট বিশ্লিষ্ট ঘটনার মাধ্যমে, পরিহাসতরল ও রঙ্গরসপূর্ণ বর্ণনার সাহায্যে মদ্যপানের ক্রম-বিস্তৃতি, বিভিন্নশ্রেনীর মাতাল, মত্ততার বিপদ, 'নেসাতেই সর্বনাশ' ইত্যাদি 'মদ খাওয়া বড় দায়' পর্যায়ের তত্ত্বকথা লেখক প্রচার করেছেন। কলকাতায় মদ্যপানের ক্রমবিস্তৃতি সম্বন্ধে তিনি বলছেন:

> "কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী কি বড় মানুষ কি যুবা কি বৃদ্ধা সকলেই মদ পাইলে অন্নত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছুদিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; সেখানে দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়?' গাজাখোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল, 'আমরা সকলেই গাজা খাইয়া থাকি। গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদের টেঁপী পিসী—যাহার বয়স ৯৯ বৎসর তারাই খারিজ আছেন।' কলিকাতা এখন তদ্রূপ।"[৩৩]

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'আগড়ভম সেন'ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার নেশার আড্ডাধারীরা 'পক্ষী'বৎ এবং নিজে সে দলের 'পক্ষিরাজ'। তার এবং সমগ্র পরিবেশটির বর্ণনা লেখক অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে করেছেন। উপভোগ্য বলে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> "আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড পেটটি একটি ঢাকাই জালা—নাকটি চেপ্‌টা—চোক দুটি মৃদঙ্গের তালা—হা-টি বোড়া সাপের মত—

৩৩। প্রথম খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ: মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে, মাতাল নানারূপী।

দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবের তবকে চিক চিক করিতেছে—গোঁফ-জোড়াটি খ্যাঙ্গরার মুড়া ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালাফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিনি চারিটা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নানআহার করেন, পরে পক্ষীদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদয় রজনী সজনী সজনী বলিয়া চিৎকার পুরঃসর সখীসংবাদ বিরহ লাহড় খেউড় টপ্পা নক্সা জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন। আগড় ভমের প্রধান বন্ধু ডঙ্কেশ্বর।.....

সন্ধ্যার সময় পক্ষীসকল বোধ করিত, তাহারা যোগবলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূণ্যমার্গে উড়িতেছে—সপ্তলোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—স্বশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক একজন পড়িতে পড়িতে উঠিয়া বলিত, আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই।' অমনি আর একজন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত—না বাবা, কর কি, একটু থাম এই ঝুলিয়া বাদে যেয়ো।' পক্ষীদের গান সকল অতি বিচিত্র। সকলে মিলে সর্ব্বদা এই গান গাইত—বড় বিলের পাখী মোরা ছোট বিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মূলা ধরেছে—কূ কূ রামশালিকে কূ কূ কূ গঙ্গাফড়িং।"[৩৪]

আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে লেখকের সমাজসচেতন দৃষ্টি সকৌতুকে লক্ষ্য করেছে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলদের ভণ্ডামী। গোপনে যারা মদ্যপ অনাচারী তারাই প্রকাশ্য আহারীদেরকে জাতিচ্যুত করবার মন্ত্রণায় লিপ্ত; তাদের মুখেই 'গেল গেল হিন্দুয়ানী'র বাণী। এ অংশই 'জাত থাকার কি উপায়' পর্যায়ের। এমন একটি 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা'সভায় উদ্যোক্তাদের সংলাপ:

বাচস্পতি। কুক্কুটের মাংস অতি উপাদেয়, মনু বিধি দেন যে বনকুক্কুট আমাদের খাদ্য। পূর্বে ঋষিরা গোমেধ করিতেন—বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন

৩৪। দ্বিতীয় খণ্ড: প্রথম পরিচ্ছেদ।

তুলনীয়: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শুভদা' উপন্যাসের বামুনপাড়ার গাজার আড্ডা। শরৎ সাহিত্যসংগ্রহ, অষ্টমসম্ভার দ্রষ্টব্য।

হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদের উদরস্থ হইত, তবে দ্বিপদ পক্ষী এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে ?…

গোস্বামী। আমি আর একটু মদ্যপান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদ্যপান করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছে না। হানপে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। সে দিবস উইলসনের যে হোটেলে মাংস খাইয়াছিলাম, সে বড় উপাদেয়।"[৩৫]

গোস্বামীর এ উক্তিতে প্রেমচাঁদ তাকে জিজ্ঞেস করল সে প্রাকাশ্যে আহার করে কি না ; এবং করে না জেনে খুশী হল, কেননা প্রকাশ্য আহারী হরিনাথ দত্তের বোনের বিয়েতে যোগদানকারীদের 'জাতমারার' ইচ্ছা তার।

প্যারীচাঁদের এই সমাজ সচেতন দৃষ্টি যে উদার ও আধুনিক ছিল তার প্রমাণ এইসব সমাজচিত্র রচনার মধ্যেই স্পষ্টভাবে বিধৃত। মদ্যপ লাউসেনপৌত্র আগড়ভমকে শিক্ষা দেবার জন্য 'ত্রপণ্ড' 'বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায়'ই উদ্যোগী, ভণ্ড প্রেমচাঁদের জাতি-রক্ষার্থসভা' পণ্ড করতে সুশিক্ষিত বলিষ্ঠ হেমচন্দ্রই সাহসী ; এ সব ক্ষেত্রে কোন আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী নিষ্ফল আস্ফালনে লিপ্ত হয়নি। প্যারীচাঁদের এ রচনা বাংলা নাটকের এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত রচনার মূল এবং এ কারণে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণও বটে। এ গ্রন্থের আগড়ভম সেনই হোঁদলকুৎকুৎ-রূপে দীনবন্ধু মিত্রের "নবীন তপস্বিনী"তে আবির্ভূত হয়েছে। তাছাড়া এ গ্রন্থের 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা', 'জাতিরক্ষার্থ সভা', ও জাতি মারিবার বাসিমন্ত্রণা' এবং 'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম আবতার' পরিচ্ছেদগুলা "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসন দুটি রচনায় মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে আর একটি খণ্ড চিত্রে লেখক তৎকালীন হিন্দুসমাজে জাতি, ধর্ম ও ধর্মধারীদের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। নর্মদা নদী তীরে নিদ্রাবস্থায় কুচবিহারের ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখল যে বৃদ্ধরূপী 'জ্ঞান' তাকে স্বর্গ দেখাবার পর

৩৫। দ্বিতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জাতি মারিবার মন্ত্রণা।

কলকাতা সহরে নিয়ে এলেন। জ্ঞান-স্পর্শে দিব্যচক্ষু লাভ করে শঠতা ও অধর্মের সমুদ্র কলকাতার অনাচারের ও ভণ্ডামীর ঘটা দেখে ব্রাহ্মণ হতবাক হয়ে গেল। এমন সময় সে দেখল একটা বিকলাঙ্গ গরু 'পালাই পালাই' ডাকছে 'একজন তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ' তার লেজ ধরে টানছে, আর এক স্বর্গকন্যা অশ্রুপাত করছেন। জ্ঞান জানালেন ওই গরু হচ্ছে 'জাতি', লোকটি 'হিন্দুগিরি আর স্বর্গকন্যা হচ্ছেন 'ধর্ম'। এরপর ব্রাহ্মণের স্বপ্নবৃত্তান্ত হচ্ছে :

> "জাতি এমনি দৌড়িতেছে যে, হাজার টানাটানিতে থামে না, হিন্দুগিরিও লেজ কসে ধরিয়া পেছনে পেছনে ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপ টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাস করিয়া ছিড়ে গেল ও হিন্দুগিরি বেগে চিৎ পটাং হইয়া ঠিকরে পড়িলেন। লেজের জ্বালার চোটে জাতির গাঁ গাঁ হাম্বা হাম্বা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলমালে আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হওয়াতে দেখিলাম, নর্ম্মদা তীরস্থ সেই বৃক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, আমার নিকটে কয়েকজন বৈরাগী বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে।"[৩৬]

শেষাংশে বৈরাগীদের খঞ্জনী বাজিয়ে গান করার সঙ্গে বিশ্ববিদারী 'গাঁ গাঁ হাম্বা হাম্বা' আর্তরবের তুলনা দিয়ে লেখক যে পরিমিত হাস্যরসের অবতারণা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক।

এ গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ 'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার'-এ একটিমাত্র বাক্যে একটি চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

> "রঙ্গপুরের রমানন্দ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।...
> ভণ্ডামীর সহিত ষণ্ডামী থাকতে আপামর সাধারণ লোকে তাঁহার কথা সর্বদা আন্দোলন করিত।"

টাইপ-চরিত্রসৃষ্টিতে এবং ভাষাব্যবহারে আলালী কৃতিত্বের পরিচয় এ গ্রন্থে দুর্লক্ষ্য নয়। রসদৃষ্টিতে প্যারীচাঁদের রচনা তত্ত্বপ্রচার প্রকটতা দুষ্ট, তবু তাঁর এই দৃষ্টির ঔদার্য ও সমাজ চেতনা অনন্যসুলভ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩৬। দ্বিতীয় খণ্ড : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতা।

২

অবশ্য এই সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের যে উদার মনোভাবের কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় তিনি সর্বদা দিয়েছেন, এমন কথা বলা চলেনা। সহমরণে উৎসাহ, বিধবা-বিবাহে বিরোধিতা তাঁর রক্ষণশীলতাকেই প্রতিষ্ঠা করে। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?' গ্রন্থে আগড়ভম ও এক বিধবা রমণীকে নিয়ে যে কৌতুক করা হয়েছে স্পষ্টতই তা বিধবা বিবাহ বিরোধিতা। এই কৌতুকের একটি দৃশ্য হচ্ছে : ডাকযোগে জনৈক বিধবা ভুবনময়ীর বরণ পত্র পেয়েছে আগড়ভম; ইতিপূর্বে ঘটক তার কাছে এক পাত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। এখন :

> "পক্ষীরাজ উক্ত লিপি পড়িয়া লোভভরে ও উদ্বাহু বাসনায় ডগমগ হইয়া বিরল স্থানে গিয়া বসিলেন এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন—আমার কি এত রূপ—এত গুণ? তবে তো আমি আত্মবিস্মৃত! তবে তো আমি অঞ্জনাপুত্র, কি আশ্চর্য! বিধবা বিবাহে কি দোষ? এখন কি করি? কোন মেয়েটিকে বিয়ে করি? একটা কি ডঙ্কাকে দিব? না—ও কি আমার কুলের পুরুত? আমি দুটো মেয়েকেই বিয়ে করে সব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং ডেং করিয়া চ'লে যাব।"[৩৭]

পরবর্তী রচনায় প্যারীচাঁদের বিধবা-বিবাহ বিরোধিতা স্পষ্টতর আকার পেয়েছে। 'অভেদী'তে তিনি সহমরণ প্রথার প্রতি সহানুভূতিশীলতা প্রকাশ করেছেন।

প্যারীচাঁদের মানসিকতায় এই স্ববিরোধের স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন। বস্তুত এই স্ববিরোধের কারণ একদিকে যেমন সমকালীন 'অসচেতন হিন্দু জাতীয়তা'র বিধৃত—যা 'মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের স্ববিরোধ' জাত[৩৮] অন্যদিকে তেমনি প্যারীচাঁদের ব্যক্তিমানস গঠনেও নিহিত। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থিয়োসফিতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন; এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকৃতি :

৩৭। দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩৮। দ্রষ্টব্য : অচ্যুত গোস্বামী। বাংলা উপন্যাসের ধারা। (নতুন সাহিত্য ভবন। কলিকাতা ১৩৬৪)। পৃ ১—১৪

"In 1860, I lost my wife, which convulsed me much, I took to the study of spiritualism which, I confess, I would not have thought of otherwise nor relished its charms."[৩৯]

ওলকট ও মাদাম ব্লাভট্স্কির থিয়োসফিকাল সোসাইটিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন ; এ সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার সভাপতির পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।[৪০] এবং 'তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।'[৪১]

ফলত এই গভীর অনুরাগ ও অধ্যবসায় তাঁর আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণাকে প্রত্যয়ের পর্যায়ে উন্নীত করে। এ কারণেই তিনি সহমরণে উৎসাহী, বিধবা-বিবাহ বিরোধী হয়ে ওঠেন ; যেন অমর যে আত্মা তাকে তিনি অমলিন অকলঙ্ক রাখতে চান। তাই বারংবার বলেছেন :

"এই ভারতভূমিতে পতিব্রত্যধর্ম্ম যেরূপ বদ্ধমূল, এমত আর কোন দেশে নাই। এ দেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি।"[৪২]
"স্ত্রীলোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, উচ্চজাতীয় হউক বা নীচজাতীয় হউক যথার্থ স্বামী পরায়ণা হইলে যাবজ্জীবন স্বামীকে স্মরণ করে ও স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসিনী হয়।"[৪৩]... ইত্যাদি।

৩৯। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'On the soul' পুস্তকের ভূমিকা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সাহিত্যসাধক চরিতমালা (২১ : প্যারীচাঁদ মিত্র), দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪০। এপ্রিল ১৭, ১৮৮২ তারিখে। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ। পৃ ১৮৫—১৮৯।

৪১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ। পৃ ১৮৬।

৪২। আধ্যাত্মিকা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪৩। ঐ অষ্টম পরিচ্ছেদ। তুলনীয় 'যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাম্য; বঙ্কিম রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : সমগ্র সাহিত্য পৃ ৪০১।

এবং সহমরণের মর্মান্তিক দৃশ্যকেও মনোহর করে-চিত্রিত করতে হয়েছে :

> "রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামীর শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্য্যে সম্পূর্ণ—দুই হস্তসংযুক্ত—বদন ঈষদ্ধাস্যান্বিত— নয়ন সমাধিতে আবৃত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল তদবধি তাহার পবিত্র রসনার হরিনাম সকলের শান্তিদায়ক হইয়াছিল।"[৪৪]

অন্যদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর—

> "সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সহমরণে গমন করিবেন; কিন্তু ঐ প্রথা নিষেধক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন।"[৪৫]

এবং 'ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসিনী' হ'লেন।

সুতরাং বলা চলে, প্যারীচাঁদের এই মানসিকতা গভীর বিশ্বাসজাত এবং সে কারণেই প্যারীচাঁদের নিজের কাছে এ স্ববিরোধ ধরা পড়েনি।

৩

প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রচনাবলী—আধ্যাত্মিক উপন্যাসগুলো—তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই আধ্যাত্মিকচেতনার গভীরে উত্তরোত্তর উৎক্রমণের কাহিনী।

'অভেদী'র নায়ক অন্বেষণচন্দ্র। তিনি সত্যান্বেষী—এবং সে কারণেই সংসারনিষ্ঠ নন। ফলে গৃহদাহে স্ত্রীকন্যাপুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি অরণ্যে ও লোকালয়ে সত্যসন্ধানে ব্যাপৃত। অন্যদিকে যথার্থই মৃত না হওয়ায় স্ত্রী পতিভাবিনী স্বামী-সন্ধানে রত। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পর্যায়ক্রমে সাধনার পর স্বামী স্ত্রীর মিলন এবং রত্না পর্বোতোপরি অভেদীর কাছে চরম দীক্ষা গ্রহণে এ উপন্যাসের সমাপ্তি। এখানে দাম্পত্যসম্পর্ক 'আধ্যাত্মিক'![৪৬] পতিসন্ধান রত পতিভাবিনীর উক্তি :

৪৪। অভেদী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৪৫। ঐ। ১৮ পরিচ্ছেদ।

৪৬। 'আমাদিগের সম্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে—আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক'। পতিভাবিনীর উক্তি। ১১শ পরিচ্ছেদ।

"নাথ সর্বদা কহিতেন, তুমি আমাকে বড় ভালবাস, তাহা আমি ভাল জানি, কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের প্রেমের পক্কতা জন্য উভয়ের আত্মা ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ এ কেবল পার্থিব সম্বন্ধ—এ সম্বন্ধীয় প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা পরস্পরের আত্মা উন্নত হইবে। যদি এ অভিপ্রায় সম্পন্ন না হয়, তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম পশুবৎ হইয়া পড়ে।"[৪৭]

দীর্ঘদিনপর স্বামী-স্ত্রীর মিলন দৃশ্য আশ্চর্য কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত ঃ

অন্বেষণচন্দ্র নিষ্কামচিত্তে ও অকুতোভয়ে ঐ রমণীর সম্মুখে বসিয়া নীরিক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা অবসান—অস্তমিত দিনমণি গবাক্ষের দ্বার দিয়া স্বীয় নানাবর্ণিয় মণিতে ঐ মহিলার মুখমণিকে যেন উজ্জ্বল মণির খনি করিতেছেন—কিন্তু তাহার অন্তরের অমূল্যমণির অবিনাশী ও অক্ষয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জা পাইতেছেন। এ নারী কে? সুনির্ম্মিত চাঁপা ফুলের ন্যায় গৌরাঙ্গী যুবতী—রূপের ছবি—কিন্তু পার্থিবভাবশূণ্যা। যাহার ধ্যানে আহ্লাদ, তাহার মন অন্যের ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়।

এবং পরস্পর পরিচয় লাভের পর ঃ

"চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ যোগিনী হইয়া রোদন করিলে?' পতিভাবিনী উত্তর করিলেন, 'এটি দুর্বলতা বটে, কিন্তু তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারিনা, তুমি এমনি আকর্ষণ কর যে, তোমাকে দেখিলেই আমি তোমাতে মগ্ন হই। অদ্য তোমাকে পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে আত্মসাধনে অনেক লাভ করিব।' পরে দুইজনের বাক্য স্থগিত হইয়া পরস্পরের আত্মা দ্বারা আপন আপন বক্তব্য যাহা ছিল, তাহা ক্রমশ প্রকাশ হইতে লাগিল ও পরস্পরের আত্মা সংযুক্ত হইয়া নানা আপার্থিব বিমল আনন্দে রাত্রিযাপন করিলেন।..."[৪৮]

৪৭। ৭ম পরিচ্ছেদ।

৪৮। উনিশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন ভোরে সরোবরে স্নানরতা যোগিনীদের সামনে পতিভাবিনী স্বামীসহ উপস্থিত হলে যোগিনীরা লজ্জিত হল। তখন পতিভাবিনী স্বামীর পরিচয় দিয়ে বলল ঃ

> "ইনি সম্পূর্ণ যোগী—ইহার স্ত্রীপুরুষ সমজ্ঞান। কেবল আত্মার সুখেই সুখী—শারীরিক সুখ বিসর্জন করিয়াছেন। তোমরা নগ্না থাক, আর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হও ইঁহার আত্মা সমভাবে থাকিবে। কিন্তু তোমরা স্ত্রীলোক—যোগেতে পক্ক হও নাই, এ জন্য আমরা উদ্যানে গমন করিতেছি।"[৪৮]

এই মূল ঘটনার পাশাপাশি বাবুসাহেব, জেঁকো বাবু ও লালবুঝকড় চরিত্রের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশিত চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কিছু কৌতুক রস উদ্দীপনের প্রয়াস আছে। এইসব ঔন্নাসিক চরিত্রের করুণ পরিণতি নির্দেশ করে লেখক স্বীয় উদ্দেশ্যের যাথার্থ্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। এ আখ্যায়িকার লালবুঝকড় চরিত্রের রূপ, বাচনভঙ্গি, পরিণতি, ইত্যাদি ঠকচাচাকে স্মরণ করিয়ে দেয়; অতখানি জীবন্ত না হলেও ঠকচাচার ছায়া এ চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

'অভেদী'তে সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নব্যদলের আচরণ সম্পর্কে প্যারীচাঁদ তির্যক মন্তব্য করেছেন ঃ

> 'পৈতাফেলা—পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইংরাজী বহি পড়ার দরুণ—আপনি কি বলেন?
>
> অশেষণচন্দ্র। তাহা হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, বাহ্য প্রবল অন্তর দুর্বল—এই জন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংস্কারাধীন। যেমন তরকারী সন্তলনকালীন হাড়িতে তপ্ত ঘৃত উপরে ফোড়ন দিলে ফড় ফড় শব্দ হয়, তেমনি প্রবল বাহ্য কারণ বশাৎ নব নব মত ও বিশ্বাসের সৃষ্টি—তাহার কি তর্জন গর্জন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবে না।[৪৯]

৪৯। সতের পরিচ্ছেদ।

'অভেদী'র পাত্রপাত্রীরা বাস্তবজীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হয়েছে। সেদিক থেকে 'অভেদী'কে হয়তবা 'রূপক উপন্যাস' হিসেবে আখ্যাত করা চলে।[৫০] কিন্তু 'আধ্যাত্মিকা' প্রকৃতই 'আধ্যাত্মিক উপন্যাস'। এখানে উপন্যাস লক্ষণ শুধুমাত্র তুলক্ষ্যই নয়, পরন্তু তা বাস্তবতা থেকে বহু দূরবর্তী। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক। মাঝে মাঝে ক্ষীণসুরে ঢুলি, বেহারা, চাকর, রাস্তায় লোক, বাজারে জনরব প্রচারক ইত্যাদি পার্শ্বচরিত্র রচনায় প্যারীচাঁদের কৌতুকবোধ ও রসসিক্ত দৃষ্টির পরিচয় মেলে এবং স্পষ্টতই অনুভব করা যায় লেখকের এই স্বরূপ ক্রমবিলীয়মান। তাছাড়া এসব পার্শ্বচরিত্র 'আলালে'র মত মূলকাহিনীর সঙ্গে সুগ্রথিত হয়েও বর্ণিত হয়নি।

নায়িকা আধ্যাত্মিকার জন্ম, শিক্ষায় বিপুল পারদর্শিতা, যাবতীয় আধ্যাত্ম-সাধনায়—বিশেষত আত্মসাধনায় চরমসিদ্ধিলাভ, সাংসারিক বিপর্যয়ে স্থৈর্য, খ্যাতি এবং সবশেষে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মৃত্যুবরণ এ উপন্যাসের কাহিনী। সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ঘটনা নির্ভর এই কাহিনীতে বাস্তবতার সঙ্গে তীব্র বিরোধ যেখানে উপস্থিত হয়েছে সেখানে 'বৈঠকী কথা' বা 'স্ত্রীলোকদিগের ভোজ ও পার্থিব কথোপকথন' কিংবা 'দোকানীদের কথাবার্তা'[৫১] ইত্যাদি রচনা করে পরক্ষণেই গভীর আধ্যাত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক অবলীলাক্রমে ব্যাপৃত হয়েছেন। বাস্তবতায় এই ক্ষণিক অবতরণ বিশ্বাসের তীব্রতার জন্যই তাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। নায়িকা আধ্যাত্মিকা বিবাহে অসম্মত; কেননা সে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, আর

> "যে সকল স্ত্রীলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন, তাহাদিগের পতি প্রয়োজন। কারণ পতি গ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে সর্বদা অর্পিত হইলে নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপন, নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন।.."

৫০। 'অভেদী পুরাপুরি রূপক উপন্যাস'।—ডঃ সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, তৃ-স ১৩৫৬)। পৃ ৯৩।

৫১। "রাস্তার লোক বলিতেছে, 'দোকানীদাদা ভাল মোর ভাই!' পেছন দিক থেকে দোকানিনী এসে বলছে, 'ওরে মিন্সে! ভাত যে কড়কড়া হল, আটকুড়ীর বেড়াল পাত থেকে মাছটা নিয়ে চলে গেল, এখন কি দিয়ে গিল্‌বি? কেবল দুগাছা সজনের ডাটা আছে।" —একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুতরাং তাহার পাণিপ্রর্থী 'ডাহা ব্রাহ্ম'

"অনঙ্গ ছল ছল চক্ষে আধ্যাত্মিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "আমি একভাবে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছি, আপনি মনুষ্য নহেন—শারীরিক ও মানসিক ভাবশূন্য। আপনাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করি।"[৫২]

আধ্যাত্মিকার পিতা হরদেব তর্কালঙ্কারের অবস্থাবিপর্যয়ের তিন বৎসর পরে একদিন :

"একজন চিড়চিড়ে পাওনাওয়ালা অন্যান্য পাওনাওয়ালাদিগের নিকট রাগ ও ঈর্ষা সংগ্রহ করত ফটাস ফটাস করিয়া উপস্থিত হইলেন। 'কোথা গো তর্কালঙ্কার? শেষটা খুব ঢলালে। আপনার বিষয় বিভব লুকিয়ে এখন আমাদিগের ফাঁকি দিতে চাহ। একদিকে ধর্ম্মের ছালা আর একদিকে ডাকাতি! গলায় দড়ে জাতিই অন্তজ। কিছু যে বলছ না?' পিতা ও কন্যা এই সকল নিন্দাতে আপন আপন আত্মার অশান্তভাব হয় কিনা, তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ। বাহ্য ঝটিকার ওষধি সহিষ্ণুতা'।"[৫৩]

তর্কালঙ্কারের মৃত্যু সংবাদে বিভিন্ন জল্পনার একটি হচ্ছে :

'মেয়েটার দশা কি হইল, ওর বা কে একটা ঘর বর দেখে দেয়, এরপর কি ব্যাভিচার দোষ ঘটবে?'

বলাবাহুল্য যাঁর জন্য এ দুশ্চিন্তা তিনি এসব পার্থিব দুর্ভাবনার বহু উর্ধে। তিনি

'খোদান্বিতা নহেন, দুঃখান্বিতা নহেন, শোকান্বিতা নহেন; শান্তা, ধ্যানযুক্তা আধ্যাত্মিকা হইয়া বসিয়া আছেন।'[৫৪]

'বামাতোষিনী'তে পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু ও স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে প্যারীচাঁদের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। নায়ক গোপাল 'সৎকুলোদ্ভব, উচ্চ চরিত্র' এবং তার 'স্ত্রীর নাম শান্তিদায়িনী, কন্যার নাম ভক্তিভাবিনী ও পুত্রের নাম কুলপাবন'।[৫৫]

৫২। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : অধ্যাত্মিকার বিবাহের প্রস্তাব।
৫৩। উনবিংশ পরিচ্ছেদ : বড় গোলযোগ।
৫৪। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : তর্কালঙ্কারের মৃত্যু সংবাদ।
৫৫। প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্যণীয় যে এসব উপন্যাসে শুধুমাত্র গ্রন্থের নামকরণে নয়, চরিত্রাবলীর নামকরণেও প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্যমূলকতা স্বতপ্রকাশিত।

ঘটনাসূত্রে 'বামাতোষিনী'তে 'ইউরোপীয় উচ্চ নারীদিগের বিবরণ' 'বিলাতীয় বিবিদিগের বিবরণ'[৫৬] ইত্যাদি রচনা করে প্যারীচাঁদ আদর্শ নারী চরিত্রের প্রতি নির্দেশ করেছেন।

'রামারঞ্জিকা'য় স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে প্যারীচাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত কথোপকথনের আকারে গ্রথিত হয়েছে। মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদের প্রথম ষোলটিতে 'গৃহকথা' পর্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। শেষ চারিটি পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে 'জাপান দেশের স্ত্রীলোক' 'সৎস্ত্রীকে স্বামী কখন ভুলিতে পারেনা', 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে পথ', 'ধর্ম্মপরায়না নারী'।

'যৎকিঞ্চিৎ'-এ এসে প্যারীচাঁদের প্রত্যয়বোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। ফলে অধ্যাত্মিক জগত ও তার ঘটনার পরিণতি স্বাভাবিক ভাবেই কাহিনী সৃষ্টি করবে—এ বিশ্বাস তিনি লাভ করেছেন। "ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ, আত্মার অবিনাশিত্ব, ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম, উপসনা, ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য, পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আত্মোন্নতি"—ইত্যাদি গূঢ় তত্ত্বকথা জ্ঞানানন্দের বক্তৃতা ও প্রেমানন্দে প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে এ গ্রন্থে। গঠন কৌশলের দিক দিয়ে সচেতন পরিচর্যার পরিচয় রয়েছে এখানে। প্রথমে কিঞ্চিত বাস্তব পরিবেশ রচনা, তারপরেই তত্ত্বকথায় প্রবেশ : এ গ্রন্থে পূর্বাপরই এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। এবং বাস্তব পরিবেশ রচনার প্রয়াস এখানে আর রঙ্গরসে অভিষিক্ত নয়।

এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় : 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব'; রামমোহন রায়ের কবিতা

'ভাব সেই একে
জলেস্থলেশূন্যে যে সমানভাবে থাকে।'—এই উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু। তারপর :

৫৬। যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"ঢং ঢং ঢং। হিস, হিস। ছোট ছোট রেলগাড়ী যায়। ওহে ভুবন উঠেছ—ও ভুবন।'…

"একখানা দ্বিতীয় ক্লাশ গাড়ীতে মধ্যবয়স্ক দুইজন ব্যক্তি বসিয়াছেন—ইহারা অতিশান্ত, মিতভাষী ও আনন্যমনা। সূর্য অস্তমিত হইতেছে। আকাশের কি চমৎকার শোভা। সকল কোলাহল যেন স্থৈর্য্য সাগরের নিমগ্ন হইয়াছে—বায়ুর মন্দ মন্দ গতি—এই সকল একত্রিত হওয়াতে বৈকালিক মাধুর্য্য প্রকৃত শান্তিদায়ক হইয়াছে। এই দুই ব্যক্তি এক একবার নভোমণ্ডল দর্শন করিতেছেন এবং এক একবার দর্শনোদ্ভব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইহারা কে? ইহারা দুই ভ্রাতা—জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ।"

"লোকে বলাবলি করিতেছে—এ দুটো গুম অবতার কোথা হইতে এলো, বোধ হয় অজ পাড়াগেঁয়ে অথবা জঙ্গুলে।"

কিন্তু এরপরই এই কৌতুকমিশ্রিত আবহ বর্জিত হল; 'নাস্তিকবাবু'দের সঙ্গে জ্ঞানানন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত যুক্তিজাল বিস্তার করতে শুরু করলেন এবং শেষে "প্রেমানন্দ করজোড়ে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করতঃ……উপাসনা করিলেন"।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে শহরে মাতালদের উপদ্রব শুরু হলে—

"এইরূপ ভ্রান্ত, অশান্ত ও নিতান্ত দুরন্ত ব্যবহার দেখিয়া সহর কোতোয়াল কৃতান্তস্বরূপ আসিয়া বাবুদিগকে ধৃত করিলেন।"[৫৭]

অবশ্য জ্ঞানানন্দের অনুরোধে তাদের মুক্তি দেওয়া হল।

এ গ্রন্থের শেষে প্যারীচাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

"এ ধর্ম্ম সমুদ্র স্বরূপ—অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদী স্বরূপ যত ধর্ম্ম আছে, তাহা কালেতে এই ধর্ম্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্ম্মই নিত্য ধর্ম্ম—এই-ই সত্য ধর্ম্ম—এই-ই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম"।[৫৮]

৫৭। দশম অধ্যায়। গল্পের শেষ।

৫৮। On the Soul পুস্তকের ভূমিকায় প্যারীচাঁদ উল্লেখ করেছেন যে—

৪

প্যারীচাঁদের শেষ পর্যায়ের বিবিধ রচনার মধ্যে 'ব্রহ্মবাদিনী' ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে বলে 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' উল্লেখযোগ্য।[৫৯]

'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' রচনা সমাপ্ত ক'রে লেখক প্রার্থনা করেছেন :

> "জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুণা যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।"

'গীতাঙ্কুর' রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ ৩৪টি ব্রহ্মসঙ্গীতের সমষ্টি।

প্যারীচাঁদের অন্যান্য প্রবন্ধ ও ইংরেজী রচনাবলী মূলত তত্ত্বনিবন্ধ : প্যারীচাঁদ মানসের কোন নতুন পরিচয় তাতে উদ্ঘাটিত হয় না বলে বর্তমানে তার আলোচনা পরিত্যক্ত হল।

"My desire to understand God and his Providence was earnest from the reading of standard works on those subjects and theists and christian authors, as well as of Arya works, in Sanskrit and Bengali, produced a living conviction that there was one God of infinite perfection. I become theist or a Brahma." ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত। পৃ ১৮৬ উদ্ধৃত।

৫৯। গ্রন্থটিতে 'আর্য্যরাজ্য', 'ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ', 'উচ্চসদ্যোবধূ', 'স্ত্রীলোকদিগের সম্মান', 'পুনর্বিবাহ', 'সহমরণ ও ব্রহ্মচার্য', 'বিবাহ', 'স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে গমন', 'রাণীদিগের রাজ্যগ্রহণ', 'পরিচ্ছদ ও গমনাগমন', 'বৌদ্ধমত', 'রাণীদিগের গৃহ', 'দয়াদি', 'চৈতন্য'—ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

৫

প্যারীচাঁদ-রচনাবলী পর্যালোচনা শেষ করার আগে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করেছি প্যারীচাঁদের মানসগঠনে 'ইয়ং বেঙ্গল', ব্রাহ্মসমাজ (রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব) ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি মুখ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তাঁর রচনাবলী বহুলাংশে প্রাচীন সংস্কারমুক্ত, ব্রাহ্ম আদর্শবাহী এবং থিওসফির জ্ঞানলব্ধ গভীর প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল। এই মিশ্র প্রভাবের ফলে আমরা তাঁর রচনায় একদিকে যেমন ব্রাহ্ম আদর্শের মহিমা প্রচারের সুস্পষ্ট অভিলাষ দেখি অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্ম রুচির কঠোর অনুসরণের প্রয়াস দেখিনা; বরং তাঁর প্রথম উপন্যাস দুটোতে তার শৈথিল্যেই প্রত্যক্ষ করি, আবার আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বশত বিধবা বিবাহ বিরোধিতা এমনকি সহ মরণে উৎসাহ লক্ষ্য করি।

এই মিশ্র মনোভঙ্গির পেছনে পূর্বোক্ত বাহ্য প্রভাব ছাড়াও স্বতন্ত্র গূঢ় কারণ আছে বলে মনে হয়। প্যারীচাঁদ মানসে সর্বদাই যেন একটি 'নীতিবোধ' সদাজাগ্রত ছিল যা তাঁর অন্যান্য বাহ্যপ্রভাব আহরণের প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা ব্রাহ্মসমাজ তাঁর চিত্তে আত্যন্তিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি বরং তাঁর সচেতন নীতিবোধের সঙ্গে থিয়োসফির কোন মৌল বিরোধ না থাকায় এই শেষোক্ত বিষয়েই তিনি অধিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই 'নীতিবোধ' উনিশ শতকী হিন্দুমধ্যবিত্ত মানসের লক্ষণ। এবং এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম মানসের উপস্থিত এই বিশিষ্ট উপাদানটির পূর্বরূপ প্যারীচাঁদে বর্তমান, এমন কথা বলা চলে। প্যারীচাঁদের আধ্যাত্মিক উপন্যাস-গুলোতে এই নীতিবোধ, ব্রাহ্মধর্মপ্রীতি ও থিয়োসফি-নিষ্ঠা আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করেছে যদিও তাঁর প্রথম দুটো রচনায় এ সমন্বয় ঘটেনি। বস্তুত প্যারীচাঁদ মানসের এই নীতিবোধ তাঁর প্রথম দুটো রচনাতেই স্বতন্ত্রভাবে সুলভ। প্যারীচাঁদ-মানসের এই সমগ্ররূপটিকে 'ধর্মগূঢ় চেতনা' বলেও আখ্যাত করা যেতে পারে।

চার

প্রচলিত কথাটি হল : বিদ্যাসাগরের 'পণ্ডিতি রীতির' গদ্যাদর্শের বিরুদ্ধে প্রথম 'বিদ্রোহী' হচ্ছেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং তাঁর এই 'বিদ্রোহ' তাঁর বিপ্লবী দৃষ্টির ফল। বলাবাহুল্য কিছু সত্য থাকলেও এই মন্তব্যটিই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারে না।

প্রথমত বিদ্যাসাগর আজীবন 'পণ্ডিতি রীতির' গদ্য রচনা করেননি। শেষ জীবনের polymics-গুলোতে তিনি স্বচ্ছন্দে কথ্যবাকভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে প্যারীচাঁদও আজীবন 'আলালী ভাষায় গ্রন্থরচনা করেননি বরং ক্রমান্বয়ে তাঁর ভাষাভঙ্গি জটিলতার পথে অগ্রসর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ভাষার ক্ষেত্রে নয় ভাবের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর সমাজমুখীন, ফলে ক্রমান্বয়ে সরলতামুখীন আর প্যারীচাঁদ ক্রমান্বয়ে জটিলতামুখীন হয়েছেন। তাই, বরং বলা যায়, কি ভাবগত কি ভাষাগত উভয় দিক দিয়েই প্যারীচাঁদ মিত্র যেন বিদ্যাসাগরের বিপ্রতীপ। এর কারণও স্পষ্ট।

'হিউম্যানিস্ট্ পণ্ডিত' বিদ্যাসাগর সাহিত্যরচনা করেছিলেন 'হিউম্যানিস্ট্' আদর্শ প্রণোদিত হয়ে।[৬০] তাঁর সাহিত্যজীবন তাঁর কর্মজীবনের প্রক্ষেপমাত্র।[৬১] তাই পুথি সন্ধান ও সম্পাদন, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সামাজিক আলোচনা মিলিয়ে তাঁর সাহিত্যসাধনা বিচিত্র। এই বিচিত্র সাহিত্যসাধনার জন্য একদিকে তিনি যেমন একনিষ্ঠ অনুশীলন করেছেন অন্যদিকে তেমনি নবজাত বাঙলাভাষার সর্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন নীরিক্ষাতে ব্যাপৃত হয়েছেন। তিনিই

৬০। দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষ। পূর্বোক্ত।

৬১। দ্রষ্টব্য : প্রমথনাথ বিশী। ভূমিকা : বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার। (অমর সাহিত্য প্রকাশনী। কলিকাতা ১৩৬৫)।

প্রথম কমা সেমিকোলন ইত্যাদি বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করে বাঙালা লিখিত ভাষাকে স্বচ্ছন্দ পাঠোপযোগী করে তোলেন। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রত্যেকটি সংস্করণে তিনি ভাষাকে ক্রমান্বয়ে সরল ও প্রাঞ্জল করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[৬২]

অন্যদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও ব্রাহ্মসমাজাদর্শ প্রাণিত, থিয়োসফিতে উৎসাহী; এবং তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম এই জ্ঞানলব্ধ ধর্ম ও ধ্যানের মহিমা কীর্তনে নিয়োজিত। ক্রমান্বয়ে এই দ্বৈত আদর্শ তাঁর মনে গভীর প্রত্যয়রূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর যে গভীর পাণ্ডিত্য তাঁর পরবর্তী রচনাবলীতে বিধৃত তা যথোপযুক্ত ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে। এখানেই প্যারীচাঁদের আর একটি নতুন পরিচয় মেলে। 'আলালী' ভাষা বলে কথিত সংস্কৃতানুসারী বাঙলা গদ্যের যে 'প্রতিবাদ'—তার পরিচয় প্যারীচাঁদের এই পরবর্তী রচনাবলীতে মেলে না; বরং বিষয়বস্তু আহরণের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ একদিকে যেমন সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তবতা থেকে ক্রমশঃ স্বীয় আধ্যাত্ম-জগতের 'বাস্তবতার' জটিল পথে সঞ্চরণ করেছেন, তেমনি ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রেও কথ্যভঙ্গি আলালীভাষা থেকে ক্রমশঃ 'সংস্কৃতানুসারী' ভাষা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য সংস্কৃত শব্দাবলীর যথাযথ ব্যবহারেই নয় প্রাঞ্জল বাক্যরীতিতে তার যথার্থ প্রয়োগেই প্যারীচাঁদের শেষ বয়সের গদ্যের বৈশিষ্ট্য নিহিত; যেমন তাঁর 'অলালী' ভাষার বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে প্রাঞ্জল বাক্যরীতিতে কথ্যশব্দ ও বাক্‌ভঙ্গির উপযুক্ত ব্যবহারে।

১৮৫৫ সালে রাধানাথ শিকদারের সহযোগী হিসেবে প্যারীচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার 'প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে' লেখা হল: "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে

৬২। দ্রষ্টব্য: ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী: সাহিত্য সংখ্যা; ভূমিকা। (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা ১৩৪৪)। পৃ।৹—৷৹।

এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।…"[৬৩] এই ভূমিকাতেই সম্পাদকদের সচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৬৪] এ কারণেই কেরীর কথোপথনে বা ভবানীচরণের রচনায় ইতিপূর্বেই কথ্যভাষা প্রযুক্ত হলেও তাদের কাছে—বিশেষত "কেরির কাছে প্যারীচাঁদের ঋণের কোন কথাই ওঠেনা।"[৬৫]

ভাষায় তীব্র শ্লেষ ও কৌতুকরস; বাক্যরীতির কথ্যভঙ্গি: কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের ভাষা ও 'মুসলমানী' ভাষা প্রয়োগ; দেশী, বিদেশী ও তৎসম শব্দের অবলীলাক্রমে ব্যবহার; ক্রিয়াবিভক্তি,—কারকবিভক্তি ও অব্যয়ের নতুন রূপ আবিষ্কার এবং সমাস, সন্ধি ও দীর্ঘ বাক্য পরিহার—এই হচ্ছে 'আলালের ঘরের দুলালে' ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য। "প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখায় কথ্যরীতির সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করেনি; সাধু ও কথ্যভঙ্গীর নানা মিশ্রণ হয়েছে। তবু চলিত ভাষার আদলে যে লঘু ভংগীর আমদানী তিনি করেছিলেন সেকালের ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে তা ছিল এক অভিনব ঘটনা।"[৬৬]

৬৩। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পূর্বোক্ত পৃ ।/০ উদ্ধৃত।

৬৪। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্ত্রীশিক্ষাই প্যারীচাঁদের মূল লক্ষ্য হলেও বাঙলা ভাষা শিক্ষার্থী বিদেশিদের প্রতিও তাঁর সচেতন লক্ষ্য ছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'আধ্যাত্মিকা'র ইংরেজীর Preface এ তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে:

(ক) আলালের ঘরের দুলাল: "The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful.

(খ) আধ্যাত্মিকা: The conversation and manners of different classes of people in differnt circumstances which have been portrayed in different styles, and which may perhaps be usefule to foreigners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali Language."

৬৫। ডঃ মনোমোহন ঘোষ। বাংলা গদ্যের চার যুগ। (দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লি। কলিকাতা। দ্বি-স ১৯৪৯)। পৃ ১৪৫।

৬৬। মুহম্মদ আবদুল হাই (ও সৈয়দ আলী আহসান)। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। পৃ ৫৬।

রামগতি ন্যায়রত্ন এই ভাষাকে 'আলালী ভাষা' বলে আখ্যাত করেছিলেন[৬৭] এবং বলেছিলেন যে আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা কিছুতেই এ হতে পারেনা। কিন্তু "এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল।"[৬৮]

বস্তুতঃ প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্ব এখানেই। বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার প্রতি বিমুখ নবশিক্ষিতদেরকে আকর্ষণ করেছিলেন সে ভাষায় প্রাণশক্তি সঞ্চার ক'রে. আর প্যারীচাঁদ এর নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ক'রে বঙ্কিমকে উৎসাহিত করলেন এই ভাষার বিপুল সম্পদ আবিষ্কারে।

ভাষাভঙ্গি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।" প্রায়োজন হলে যে কোন 'রীতির' ভাষা প্রয়োগ করতে হবে "আপত্তি কেবল নিষ্প্রয়োজনে"।[৬৯] এবং প্রতিভাধর যিনি তিনি প্রয়োজনানুসারে ভাষাপ্রয়োগের দক্ষতা স্বতই অর্জন করেন। বিদ্যাসাগর ও. প্যারীচাঁদ এদিক দিয়ে সগোত্র; প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগে সমকালীন মাপকাঠিতে তাঁরা পূর্বাপর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।[৭০]

৬৭। দ্রষ্টব্য: বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। গীরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। (চুচুড়া বুককোম্পানী। চ-স ১৩৪২)।

৬৮। শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত পৃ ১৩১।

৬৯। বাঙ্গালা ভাষা। বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড: সমগ্র সাহিত্য। পৃ ৩৭৩।

৭০। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন:

'Their style varies between the literary and colloquial, and bears testimony to the uncertainty still pervailing in Bengali Prose style in the third quarter of the century.' —J. C. Ghosh : Bengali Literature (Oxford Univerity Press. London, 1948) p. 129.

পাঁচ

সবশেষে পুনরুক্তি ক'রে বলা যেতে পারে, প্যারীচাঁদের খ্যাতির উৎস তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' হলেও তাঁর মানসিকতার পূর্ণ পরিচয় সেখানেই বিধৃত নেই। সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্যকর্ম মর্যাদা পেতে পারে 'for its significance in the history of ideas'।

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ('imitation of life') কিন্তু তা সর্বদাই ব্যক্তি-বিশেষের মানসভঙ্গিজাত; "That is to say it can only be a knowledge of other people's knowledge of life, not of life itself"। বলা চলে, তা হচ্ছে "the view of life of a person who was a good observer within his limits"।[১১] তাই ধর্মচেতনা যে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়েছে তাঁর রচনা স্বভাবতই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির রচনা থেকে পৃথক হবেই। এই কারণে প্যারীচাঁদের অধিকাংশ রচনাই আজকের পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়; প্যারীচাঁদের সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁর রচনা সকল 'রসবেত্তা-অধিগম্য' হয়ে ওঠে নি। তবু এ প্রসঙ্গেই 'বাঙলা ভাষায় বিমূর্তচিন্তা প্রকাশ দুঃসাধ্য'—একথা যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের প্যারীচাঁদের জটিল তত্ত্বালোচনাকীর্ণ রচনাবলী পড়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার পুরোভাগে জাগ্রত নায়কের দায়িত্বে তিনি আজীবন অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি সত্য, কিন্তু তাঁরই দিকনির্দেশে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অতি অল্প কালের মধ্যেই আশ্চর্য প্রাণশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনীকারের অতি মূল্যবান দায়িত্ব তিনি পালন ক'রে গেছেন; এই একটিমাত্র কৃতিত্বেই তিনি অবিস্মরণীয়।

১১। T. S. Eliot: Religion and Literature. Selected Prose (Penguin Books. 1953 edn.) P. 39.